নতুন কিছু ভাবা, নতুন কিছু লেখা

অচিন্ত্য দাস

বাংলা পরীক্ষা চলছে, আর মাত্র দশটা মিনিট বাকি। ক্লাসের ফার্স্ট বয় মাথা নিচু করে খস্ খস্ করে ঝড়ের গতিতে রচনা লিখছে। উপসংহার লিখে শেষ দাঁড়িটি দিতেই ঘন্টা পড়ল— ঢং - ঢং- ঢং। লেখাটার ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বিরস মুখে সে খাতা জমা দিল। নিজের লেখা তার বিশেষ পছন্দ হয়নি। নতুন প্রেমিক অনেক যত্নে লেখা প্রথম চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে ভাবল, এঃ কিছুই তো ঠিক করে বলা হলো না। আরেকটা অন্তত খসড়া করা উচিত ছিল। রাত্তিরে জানালার ধারে বিছানায় বসে উঠতি কবি কবিতা লিখছে। তার মাথায় রকমারি কল্পনা ঘুরে ফিরে আসছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সে সব কল্পনার কিছু অংশ হাজির হচ্ছে কলমের ডগায়। কলম অবশ্য সাদা কাগজে যা লিখছে, তা কবিবরের একটুও ভালো লাগছে না। বেচারা কাগজ কিছুতেই বুঝতে পারছে না তার দোষটা কোথায়! তাকে কেন বারবার খাতা থেকে নির্দয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দুমড়ে মুচড়ে কঠিন মেঝেতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

লেখা আসলে একটি সৃষ্টিধর্মী কাজ। আর এই জন্যই লিখতে বসলে কাটাকুটি ভাঙাগড়া সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির একটা মজার খেলা চলতেই থাকে।

ইস্কুলের বাংলা পাঠ্যক্রমে ক্লাসে যে বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের যেভাবে পরীক্ষার জন্য পড়াশুনো করতে হয়, তাতে এই সৃষ্টিধর্মী ব্যাপারটি সেরকম গুরুত্ব কখনই পায় না। পাঠ্যক্রমে যা আছে তা থাক, তার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে অপ্রথাগত ভাবনাচিন্তা, ব্যতিক্রমী ও অপরিচিত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার - এসব নিয়ে একআধটু আলোচনার অবকাশ থাকা কি জরুরী নয়?

বিদেশে সৃজনশীল রচনা বা 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং' এর ক্লাস হয়। ইস্কুলে, এমনকি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 'ক্রিয়েটিভ রাইটিং' -এর ছোট বড় নানারকম শিক্ষাক্রম আছে। শুধু গল্প প্রবন্ধ বা কবিতা লেখা নয়, সৃজনশীল রচনা শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবহারিক দিকও আছে। যেমন সাংবাদিক হতে গেলে কিংবা জনসংযোগ বা বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ করতে হলে যে কোনো বিষয়কে নতুনভাবে উপস্থাপিত করার ক্ষমতা থাকা চাই। যে কোনো দেশেই খুব কম ব্যক্তি সাহিত্যকে জীবিকা হিসেবে নিতে পারে, আর যাঁরা বড় সাহিত্যিক, তাঁরা ওসব ক্লাস - ট্লাস না করেই যে উত্তম সাহিত্য রচনা করেছেন, তা বলাই বাহুল্য। তাহলেও নিছক সখের লেখক হবার মধ্যে যে একটা প্রাণভরানো আনন্দ থাকে, তা অস্বীকার করা যায় না। যাঁরা কম বয়সে সঙ্গীত শিক্ষার সামান্য সুযোগও পেয়েছেন, পরিণত বয়সে তাঁরা সঙ্গীত অনেক বেশি গভীর ভাবে উপভোগ করতে পারেন। ছোট বয়সে সৃজনশীল রচনা সম্পর্কিত আলোচনা শুনলে ভবিষ্যতে তারা সাহিত্য অনুরাগী হয়ে উঠতে পারে। এসব ছাড়াও সৃজনশীল রচনা নিয়ে আলোচনা জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়। আমাদের চারিদিকের ঘটনাপ্রবাহ, মানুষজন, এমনকি নিজের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ক্ষমতা, জীবনের একটি বড় শিক্ষা।

আমাদের দেশে বাংলা পাঠ্যক্রমের বাইরে এ ধরনের আয়োজন আছে কি, যাতে স্কুলের ছেলেমেয়েরা সাহিত্যরচনার প্রাথমিক পাঠ নিতে পারে? সঠিক জানা নেই, তবে থাকলেও তা খুবই নগন্য। এ ধরনের উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের রচনাশক্তি তো বটেই, কল্পনাশক্তিও বাড়িয়ে তুলবে। কল্পনাশক্তি বাড়ানোর কথা যখন উঠল তখন সৃজনশীল রচনা শিক্ষার একটি ক্লাস কল্পনাতেই আয়োজন করে নেওয়া যাক।

সোমবার থেকে শুক্রবার, এই পাঁচদিন রোজ দুঘন্টা করে ক্লাস হবে। পাঁচ দিনেরই পাঠ্যক্রম, তারপর অবশ্য কোনো পরীক্ষা - টরীক্ষা নেই। গরমের ছুটি, তাই সকালে আসতে কোনো অসুবিধে নেই। তবে প্রথমবার তো, তাই শুধু পাঁচজন ছাত্রছাত্রী হয়েছে। এরা সকলে একই ইস্কুলে না হলেও একই ক্লাসে, নবম শ্রেণীতে পড়ে। অর্ণব, মৈনাক, পারিজাত, পারমিতা আর সাহানা। ছাত্রী দুজনের সঙ্গে ওদের মায়েরা এসেছিলেন পৌঁছে দিতে। যে ঘরে ক্লাস হবে তার দরজা ভেজানো ছিল, বাইরে একটা কালো বোর্ডে চক দিয়ে বড় বড় করে লেখা ছিল, 'সৃলেখা'। তা দেখে পারমিতার মা চাপা গলায় সাহানার মাকে বললেন —''দেখেছ বানানের ছিরি, যেটুকু বাংলা শিখেছে তাও ভুলে না যায়!''

ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবকদের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে মাস্টারমশায় হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি, খালি পা। এক গাল হেসে পারমিতার মাকে আশ্বস্ত করে বললেন— ''না, বানান ভুল নয়, ওটা হলো 'সৃজনশীল লেখা'র সংক্ষিপ্ত রূপ।'' যাক্ তাও ভালো, অভিভাবকেরা চলে গেলেন। সৃজনশীল লেখার প্রথম পাঠ শুরু হলো।

মাস্টারমশায় বললেন— ''আমি এখন তোমাদের একটি গল্প বলব, তোমাদের জানা গল্প অবশ্য। গল্পের নায়ক হলো একটি গাধা।'' মৈনাক আর অর্ণব ফিক করে হাসল। সাহিত্য রচনা শুরুতে আর কিছু পাওয়া গেল না, একটা গাধার সঙ্গে মোলাকাত! মাস্টারমশায় লক্ষ্য করলেন কি না বোঝা গেল না, তিনি গল্প শুরু করলেন।

''গাধাটি রোজ নুনের বস্তা নিয়ে একটা নদীর সাঁকো পেরিয়ে তার মালিকের সঙ্গে হাটে যেত। একদিন পা পিছলে সে নদীতে পড়ে গেল। লোকটির সাহায্যে কোনোক্রমে জল থেকে উঠল, কিন্তু অবাক কান্ড! গাধা দেখল বস্তা অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। পরের দিন সে নিজেই ঝাঁপ দিল। তারপরের দিনও দিল, কিন্তু লোকটি সেদিন নুনের বদলে তুলো ভরেছিল বস্তায়। ভেজা তুলোর ওজন দশগুন হয়ে যাওয়ার গাধার কষ্টের শেষ রইল না।

এ গল্প আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এবারের তোমাদের কাজটা মন দিয়ে শোনো! তোমরা এই গল্পটাই লিখবে অন্য ভঙ্গিতে, কাহিনীটি গাধার চোখ দিয়ে দেখে, মানুষের চোখ দিয়ে নয়।''

এ গল্প এত চেনা, আর গল্পের নিচে বড় বড় অক্ষরে গল্পের শিক্ষা — ''বেশি চালাকি করা ভালো নয়'' এতবার সকলে দেখেছে যে, এ গল্প অন্যরকম ভাবে লেখার কথায় সবাই থমকে গেল। তবু ব্যাপারটা বেশ মজার, মিনিট কুড়ি - পঁচিশের চেষ্টায় প্রত্যেকেই কিছু

না কিছু একটা দাঁড় করিয়ে ফেলল। মাস্টারমশায় সব কটি লেখা যত্ন করে পড়লেন, তারপর পারিজাতের লেখাটি আলোচনার জন্য বেছে নিলেন। তা পারিজাত লিখেছিল ভালো। ও নিজেই পড়ে শোনালো।

আজ কত বছর হয়ে গেল গাধাটা বস্তা বহেই যাচ্ছে, বহেই যাচ্ছে। এই লোকটি নুন বিক্রি করে টাকা আনে। আরও কত টাকা চাই এর? গাধার আবছা মনে পড়ে, সে যখন এই ছোট্টটি ছিল তখন তার মা জিভ দিয়ে তাকে আদর করতো। বাবা কাজ করত ধোপার বাড়িতে। তার আরও দুটি ভাই ছিল, সে তাদের সঙ্গে খেলত। একদিন সে বিক্রি হয়ে গেল এই লোকটির কাছে। সে কত চেঁচাল— যাবো না, যাবো না, —কিন্তু কে শোনে তার কথা! ওর আসলে পা পিছলে যায়নি। নদীর জলে ওর মনে হলো ওর মা দাঁড়িয়ে আছে, - ওকে ডাকছে। ও ঝাঁপ দিল, তারপর - আহা কী শান্তি। জলে সারা শরীর জুড়িয়ে গেল, ওজনও কমে গেল অনেক। তারপরের দিনও একই অভিজ্ঞতা। যাক, একটা উপায় হয়েছে তাহলে। যা কষ্ট চলছিল! কিন্তু আজ একি হলো? এ-যে দশমন বোঝা চেপে বসেছে পিঠে। লোকটাই বা এত হাসছে কেন? গাধা কোনো রকম মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল - সেখানে কি কেউ আছে যে তার কষ্ট দেখতে পাচ্ছে, যে তার জন্য কিছু করবে?

—''তাহলে দেখ'', মাস্টারমশায় বললেন, ''অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে রচনাটি সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে। ঘটনা একই, চরিত্রও তো সেই একই। তোমরা তো জানোই রামায়ণের কাজিনী লঙ্কেশ্বর রাবণের দিক থেকে বর্ণনা করে কবি মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' পুরোপুরি নতুন রস সৃষ্টি করেছিলেন। 'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথ পালা করে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বিমলা, নিখিলেশ আর সন্দীপের জবানি ব্যবহার করেছেন। কাহিনীর সন্নিবেশ, ঘটনাপ্রবাহ তো একই, তবু তা এক একজনের চোখে যে এক একরকম, তা সূক্ষ্ম ভাবে প্রকাশ করার জন্য তিনি এই শৈলী বেছে নিয়েছিলেন। যখনই এমন কিছু ঘটনা ঘটবে, যাতে তুমি জড়িয়ে পড়ছ বা যা তোমাকে বিচলিত করছে, তখন চেষ্টা করবে ঘটনাটি অন্যদের চোখ দিয়ে দেখতে। তোমাদের অস্তে আস্তে ধারণা হবে, জীবন কত বিচিত্র। সাহিত্যে ভালোমন্দের প্রশ্ন আছে অনেক পরে। সাহিত্য প্রথমে বুঝতে চায়, বোঝাতে চায় মানুষের মনে কী ছবি আঁকা হচ্ছে, কী ঝড় উঠছে। মনে রেখো এ শুধু লেখার ক্ষেত্রে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও ভীষণভাবে সত্যি একটি মানুষ যখন তার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে তখন সে দেখারও রকমফের হয়। কখনো সে হয়তো, নিজের দোষগুণ নিজের সফলতা এবং ব্যর্থতা তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের চোখ দিয়ে দেখতে চায়। আবার কখনো কোনো নিভৃত মুহূর্তে হয়তো সে মনের গভীর থেকে জীবনকে উপলব্ধি করে। সে উপলব্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হতে পারে। যেমন ঝুম্পা লাহিড়ীর গল্পের সেই লোকটি। লোকটি কোনো রকমে কলেজ পাশ করে অনেক ঘাটের জল খেয়ে আমেরিকায় এসে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। গল্পের শেষ কটা লাইনে সে বলেছে ঃ ''আজ ত্রিশ বছর হয়ে গেল আমি এই আমেরিকা মহাদেশে আছি। আমি জানি আমি যা করতে পেরেছি তা সাধারণ ছাড়া অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো আর একমাত্র ব্যক্তি নই। তবু কখনো কখনো নিভৃত মুহূর্তে হয়তো সে মনের গভীর থেকে জীবনকে উপলব্ধি করে। সে উপলব্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হতে পারে। যেমন ঝুম্পা লাহিড়ীর গল্পের সেই লোকটি। লোকটি কোনো রকমের কলেজে পাশ করে অনেক ঘাটের জল খেয়ে আমেরিকায় এসে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। গল্পের শেষ কটা লাইন সে বলেছে ঃ ''আজ ত্রিশ বছর হয়ে গেল আমি এই আমেরিকা মহাদেশে আছি। আমি জানি আমি যা করতে পেরেছি তা সাধারণ ছাড়া অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো আর একমাত্র ব্যক্তি নই যে ভাগ্যের সন্ধানে এই দেশে এসে থিতু হয়ে বসেছে। আর প্রথম কোনোমতেই নই। তবু কখনো কখনো আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকি, আমার পরিচয় হয়েছে, যে যে কক্ষে আমি ক্লান্ত রাত্রি কাটিয়েছি - তাদের স্মৃতি আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। আমার জীবনের এসব কাহিনী যতো সামান্যই হোক না কেন, সময় সময় আমার মনে হয়, এ-সমস্তই যেন আমার কল্পনা অতীত।'' (দ্য থার্ড এনড্ ফাইনাল কন্টিন্টে, ঝুম্পা লাহিড়ী)।

যে পাঁচজন সৃলেখার ক্লাস করছে তারা সকলেই ইংরেজী আর বাংলায় ভালো। পাঠ্যবই -এর বাইরে গল্পের বই পড়তে এরা ভালোবাসে, কিন্তু এই ক্লাসে মাস্টারমশায় যা শেখাচ্ছেন তাতে এদের দারুণ আগ্রহ জন্মেছে। নতুন করে ভাবা আর নতুন করে লেখার মধ্যে যে একটা নেশা আছে সেটা এরা বেশ টের পাচ্ছে। পরের দিন ক্লাসে সময়ের আগে পাঁচ মূর্তি এসে হাজির।

মাস্টারমশায় বললেন, — ''আজকেও সেই গাধা নিয়েই গল্প হবে। তবে আজকের কাজটা একটু শক্ত। চরিত্র একই থাকবে, ঘটনাও একই থাকবে, কিন্তু অন্য গল্প তৈরি করতে হবে।''

পাঁচজনেরই মাথায় হাত। এ আবার হয় না কি! চরিত্র আর ঘটনা নিয়েই তো গল্প। সব কিছু এক থাকবে অথচ গল্প পাল্টে দিতে হবে! তা কি হয়? এদিকে মাস্টারমশায় মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন— ''ভাব, ভাব, খাতায় আঁকিবুকি কাটো, দেখবে কিছু না কিছু রাস্তা পেয়েই যাবে।'' দেখা গেল মাস্টারমশায়ের কথাই ঠিক। এক এক করে পাঁচজনেই কিছু না কিছু লিখতে শুরু করলো। মাস্টারমশায় দু-একজনকে সাহায্য করলেন। তবে ঘটনা এক রেখে গল্পের ছায়া পুরোপুরি কাটানো তেমন করে সম্ভব হলো না। এক অর্ণব ছাড়া। মাস্টারমশাই যা চাইছিলেন অর্ণবের লেখাটি তার কাছাকাছি এসেছিল। অর্ণবই পড়ে শোনাল।

অনেক কষ্টে লোকটি কোনোরকমে তার গাধাটিকে জল থেকে তুলল। ইস্, অর্ধেকের বেশি নুন জলে গলে বস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে। অনেক লোকসান হয়ে গেল। পাড়ে এসে লোকটি গাধাকে জিজ্ঞেস করলো— ''কি হে, পড়ে গেলে কেন?'' প্রশ্ন শুনে গাধা ভীষণ রেগে গেল। চোখ পাকিয়ে বলল— ''পড়ে গেলাম কেন! তোমার লজ্জা করছেনা জিজ্ঞেস করতে? তুমি জান যে বস্তা নিয়ে যাবার সময় আমি কেবল সামনের দিকেটা দেখতে পাই। সাঁকোর রেলিং যে ভেঙে গেছে তা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন? যদি আমি মরে যেতাম তাহলে কে দায়ী হতো? বলো আমাকে, কে দায়ী হতো?''

লোকটি আর কী করে, চুপ করে গেল। কিছু দূর গিয়ে গাধা বলল — ''শোনো, তুমি আজকাল অনেক বেশি ওজনের বস্তা আমাকে দিয়ে বহাচ্ছ। যা ওজন আমার নিয়ে যাবার কথা তার থেকে বেশি আমি বইব না।'' পরের দিন একই ঘটনা ঘটল, তবে সেদিন গাধা জল থেকে নিজেই উঠল। নিজেই ঝাঁপ দিয়েছিল কি না। বলল — ''রোজই এরকম হবে যদি না বস্তার ওজন কমাও।''

নুনের ব্যবসায় এত ক্ষতি হয়ে গেল যে, লোকটি নতুন ব্যবসা ধরল। তুলোর ব্যবসা। গাধা অবশ্য জানতো না যে সেদিন বস্তায় অন্য জিনিস ভরা হয়েছে। তবু আয়তনটা বেশি মনে হওয়াতে সে আগের মতো জলে ঝাঁপ দিল।

এবার লোকটি হায় হায় করে উঠল। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো— ''হায় গাধা। তুমি এ কী করলে! নুনের বস্তা জলে পড়লে তাও অর্থেকটা বেঁচে যাচ্ছিল, এবারযে আমার পুরো তুলো নষ্ট হয়ে গেল!''

সেই শুনে গাধা আগের দিনের থেকেও বেশি রেগে গেল। তার চোখ আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরতে লাগল। ভীষণ কর্কশ স্বরে সে বলল— ''এক্ষুনি বস্তা নামাও আমার পিঠ থেকে। নুন ছাড়া অন্য কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়ার চুক্তি হয়নি তোমার সঙ্গে। তুমি আজ যা করেছে তা সম্পূর্ণ বেআইনি। আমি তোমার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করব।''

অর্ণবের গল্প পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও হাসির লহর চলল কিছুক্ষণ। মাস্টারমশায় নিজেও হাসছিলেন। তবে তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি অর্ণবের লেখায় খুব খুশি হয়েছেন। বললেন — ''তোমার গল্প শুনে আমরা সকলে যে খুব হাসলাম সেটা একটা ভালো লক্ষণ। সৃজনশীলতা নিয়ে একটা নামকরা বই আছে। নাম — 'দ্য অ্যাক্ট অফ্ ক্রিয়েশন', লেখক আর্থার কোয়েস্টলার। এই বই এ তিনি দেখিয়েছেন নতুন কিছু ভাবতে পারার ক্ষমতা, তা সে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তার সঙ্গে হাস্যরস সৃষ্টির একটা ঘনিষ্ঠ যোযাযোগ আছে। যাঁদের কথাবার্তায় বা লেখায় নির্মল হাস্যরস স্বাভাবিক ভাবে আসে, তাঁদের মধ্যে মৌলিক এবং নতুন চিন্তার বীজ থাকতে পারে। আর একটা মজার কথা হলো পাগলামি, সৃজনশক্তি আর হাসির কথা বলা — এই তিনের মধ্যে নাকি খুব সামান্যই তফাৎ।

তোমার লেখাটার মধ্যে আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে। তোমরা ইস্কুলে পড়, বয়স কম। কাজকর্মের জগতে ঢুকতে এখনও অনেক দেরি। তবু খবরের কাগজে, টিভিতে দেখেছ যে, শ্রমিকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের অনেক সময় মতের মিল হয় না। তোমার লেখার মধ্যে এই ভাবটা যেন উঁকি দিচ্ছে। অবশ্য আমার মনে হয় না তুমি এটা ইচ্ছে করে এনেছো, লিখতে লিখতে এটা এসে গেছে। গল্প কবিতা পাঠ করে আমরা প্রায়ই 'অন্তর্নিহিত অর্থ' বার করতে উঠে পড়ে লেগে যাই। ধর রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি। এটি প্রকাশের পরে কত যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তা ঠিক নেই। এখন মনে হয় নদীতীরে বর্ষার দৃশ্য দেখে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মনে স্বতস্ফূর্তভাবে এসে গিয়েছিল। শ্রাবণের ভরা নদীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের গভীর থেকে, হয়তো বা চেতন নয় অবচেতন থেকে, জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, তাঁর জীবনদর্শন আপনা থেকেই মিশে গেছে। কবিতাটির চলন এত স্বাভাবিক, এত সাবলীল যে মনে হয় না রবীন্দ্রনাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভেবেচিন্তে একটি একটি করে লাইন লিখেছিলেন। লেখার মধ্যে লেখকের গভীর উপলব্ধি আপনা থেকে মিশে যাওয়া সাহিত্যের একটি মহান গুণ। সচেতন ভাবে চেষ্টা ক'রে যে লেখায় প্রতীক আনা হয় তার উপভোগ্যতা এবং সাহিত্যমূল্য তুলনায় খানিকটা কমই বলা চলে।''

সুলেখার ক্লাস জমে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীরাই শুধু নয় তাদের মা - বাবা ভাইবোনেরাও আগ্রহী হয়ে পড়েছে। সাহানার দাদা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে, গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সব শুনে সে বলল—''তৃতীয় সুর আর ষষ্ঠ সুর নিয়ে তো তোরা কামাল করে দিচ্ছিস। বেশ মজার ক্লাস তো, আমাকে ভর্তি করে নিবি?''

পরের দিন মাস্টারমশায় যে কাজটা দিলেন সেটা আগের থেকে সহজ বলা যায়। বিষয় অবশ্য সেই গর্দভপুঙ্গব। আজ গাদা থাকবে, লোকটি থাকবে, উপকরণ মানে নুনের বস্তা এসবও থাকতে হবে, কিন্তু ঘটনার ওপর কোনো বাধানিষেধ নেই। অন্যরকম ঘটনা ঘটিয়ে গল্পকে নতুন রাস্তায় নিয়ে যেতে হবে।

বাধানিষেধ না থাকায় আজ সকলের লেখাই বেশ তরতর করে এগিয়ে গেল। এই কদিন নতুন জিনিস লিখতে লিখতে এদের লেখায় বেশ খানিকটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে। শুদু বাক্য বিন্যাসের উন্নতি নয়, এদের মধ্যে চিন্তার নতুনত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। মনের মধ্যে বসে যাওয়া ছবি ও ধারণা ছাপিয়ে এরা নতুন কিছু ভাবতে শিখছে। খাতা দেখে মাস্টারমশায় আজ বেজায় খুসি। পাঁচ জনেই ভালো লিখেছে, জানা গল্পের চৌহদ্দি পেরিয়ে এদের গল্প অপ্রচলিত রাস্তায় এগিয়ে গেছে। চারজনের গল্প পড়া হলো, আর তারপর মাস্টারমশায় পারমিতার গল্পটি নিজেই পড়লেন। সকলেই স্বীকার করল, পারমিতার গল্পের নতুনত্ব সব থেকে বেশি। পারমিতা লিখেছিল ঃ

কেন যে শ্যামাচরণ জমিদারের লেঠেলদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়েছিল! কিন্তু না করে তো উপায় ছিল না, ওরা যে তার চাষ করা জমির ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছিল। ভোর না হতে শ্যামাচরণ তার গাধাটিকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। মানে যেতে হলো, প্রাণে বাঁচার জন্য। যেতে যেতে তারা এসে পড়ল অদ্ভুত একটা জায়গায়। এবড়ো খেবড়ো চোর কাঁটায় ঢাকা পাথুরে মাঠ। একটা সরু নদী আর তার পরেই ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের সারি। জনমানব চোখে পড়ছে না, এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এমন সময় মাঠ বন কাঁপিয়ে বাঘের গর্জন। শ্যামচরণ তার সঙ্গীকে নিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সেখান থেকে দেখল এক বাঘিনী তার দুটো বাচ্চা নিয়ে একটা পাথরের কাছে এল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ওরা পাথরটা জিভ দিয়ে চাটতে লাগল। বাঘেরা চলে যেতে শ্যামাচরণ বলল— ''এই, তুই তো বহুদিন জঙ্গলে ছিলি, বাঘগুলো ওই পাথরটা চাটল কেন বলতো?'' গাধা উত্তর দিল, ''তাও জান না, ওটা হচ্ছে নুন পাথর। সব জন্তুদেরই ওটা চাটতে হয়, নইলে অসুক করে।''

''আচ্ছা, শ্যামা'' —গাধা একটু ভেবে বললো— ''এক কাজ করা যাক। ওই রকম পাথর এখানে অনেক। আমরা যদি একটু একটু ক'রে ভেঙে নিয়ে যাই, হাটে বিক্রি করি, তাহলে আমাদের দিন চলে যাবে। ঠিক কি না?'' শ্যামাচরণের কথাটা মনে ধরল। সে নুনের ব্যবসা শুরু করল। বস্তাভর্তি নুন গাধার পিঠে চাপিয়ে সে শহরে নিয়ে যায় আর যা পয়সা পায় তা দিয়ে খাবার দাবার জিনিসপত্র কেনে।

বেশ চলছিল। কিন্তু নুনের ব্যবসায় মন্দা এল। দাম পড়ে যেতে লাগল। সংসার আর চলে না। এমন সময় তারা একদিন দেখল বনে বনে আগুন লেগেছে। লালে লাল হয়ে গেছে গাছের মাথাগুলো। আসলে ওগুলো ছিল শিমুল গাছ। আর কদিন পরেই ফুল থেকে ফল এল। সেই ফল ফেটে সাদা সাদা তুলোর গোলক উড়ে বেড়াতে লাগল হাওয়ায় হাওয়ায়। শ্যামাচরণ ভাবল — বা রে এতো বেশ! সে নুনের ব্যবসা ছেড়ে বস্তা ভরে তুলো নিয়ে যেতে লাগল শহরে। তুলোর ব্যবসায় লাভ বেশি। শ্যামাচরণের টাকা হলো। সে একটা ছোট্ট বাড়িও করে ফেলল। সারাদিনের কাজের শেষে শ্যামচরণ গুড়গুড় করে হুঁকো টানত আর বাড়ির সামনে ঘাসের জমিতে গাধা পেট ভরে ঘাস খেত। তারা তাদের সুখ দুঃখের কথা কইতো। সে কথা অবশ্য আমরা বুঝতে পারব না, গাধার ভাষা শ্যামাচরণই জানত কেবল।

মাস্টারমশায়ের পড়া শেষ হলে কয়েক সেকেন্ড কেউ কোনো কথা বললো না। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, গল্পটা তাদের মন ছুঁয়েছে। মাস্টারমশায় জিজ্ঞেস করলেন— ''আচ্ছা ভেবেচিন্তে বলতো, এই গল্পটা ঠিক কী কারণে মূল গল্পটির থেকে আলাদা?''

এতো বড় অদ্ভুত প্রশ্ন? পারমিতা অন্যরকম একটা গল্প লিখেছে। তাই আলাদা। এর মধ্যে আবার কারণ বার করা যায় না কি।

সাহানা বলল— ''গাধা একবারও জলে পড়েনি, গল্প তাই অন্যরূপ নিয়েছে।'' অর্ণব বলল — ''পারমিতা শ্যামাচরণ আর গাধাটিকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে, তাই গল্পও আসল কাহিনী থেকে সরে এসেছে।'' মাস্টারমশায়ের মৃদু হাসি আর মাথা নাড়া দেখে মনে হচ্ছিল, সঠিক উত্তর এখনও খুঁজে পায়নি তারা। তাই দেখে মৈনাক আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বলল— ''এ গল্পে গাধা আর মানুষ দুই বন্ধু, তাই।''

মৈনাকের উত্তর শুনে মাস্টারমশায় ভারী খুশি হয়ে বললেন ''বাঃ, তোমার মতের সঙ্গে আমার মত শতকরা একশ ভাগ মিলে যাচ্ছে। পারমিতার গল্পে গাধা মানুষের ভারবাহী জানোয়ার নয়, গাধা মাইনে করা মজুরও নয়, গাধা আর মানুষ পরস্পরের বন্ধু। এই সম্পর্ক পাল্টে যাওয়াতে গল্পের প্রকৃতি যতটা বদলে গেছে, ততটা আর কিছুতে নয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ্য চরিত্রদুটির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট থাকবে ততক্ষণ অন্য পটভূমি নিয়ে এসে অন্য ঘটনা ঘটালেও গল্পের মেজাজ তেমন পাল্টাবে না।

মানুষের মনের কোনো সংজ্ঞা হয় কি? কেউ কেউ বলেন, মানুষের মনে শুধু তার অন্তর্জগত নয়, মন হলো বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের যোগাযোগের সেতু। তাই যদি হয়, তাহলে মানতেই হবে যে, সে সেতুটি মোটেই সরল সাধারণ নয়। অন্য আরেকজনের অস্তিত্ব মন সবসময় সমানভাবে গ্রহণ করে না। যেমন ভাবে মন তা গ্রহণ করে, তারই আরেক নাম সম্পর্ক। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয় 'সম্পর্ক' -এর মতো জটিল বিষয় আর হয় না। রামায়ণ - মহাভারত থেকে শুরু করে এই হাল আমালের লেখা, সর্বত্র দেখবে কবি সাহিত্যিকেরা এই বিষয়টি নিয়ে বারবার মাথা ঘামিয়েছেন। যেমন ধর, এই মেয়েটির কথা। মাস্টারমশায় একটা পত্রিকার পাতা ওল্টালেন পড়ে শোনাবার জন্য। ''মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল মিহির নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে। নানা কারণে মেয়েটি মিহিরের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। মেয়েটির স্বগোতোক্তি ঃ মিহির চায় আমাদের সম্পর্ক ভেঙে দিতে। নয়ত ছিঁড়ে দিতে। সম্পর্ক কীসের তৈরি? খোলমকুচির? পাথরের? না কি তারের? সুরপতির হাতে পড়লে গান হয়ে ওঠে, অসুরপতির হাতে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যায়! আর মিহির একাই বা কেন! আমিও চাই ভাঙন।'' ('টান', তিলোত্তমা মজুমদার)

গল্প এরপর নিজের রাস্তা ধরে চলতে থাকল, কিন্তু এই অংশটির মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। সম্পর্ক নিয়ে যে কটা বাক্য মেয়েটি বলেছে, তার শেষে হয় জিজ্ঞাসা, নয় বিস্ময়বোধক চিহ্ন? সম্পর্ক কেন ভাঙে, কেন গড়ে তার স্পষ্ট উত্তর নেই। আর সেই উত্তরহীনতা থেকে একটা বিস্ময়বোধ আমাদের আচ্ছন্ন করে, সে সাহিত্যেই হোক আর বাস্তবেই হোক।

মানুষ যখন যে এলাকায় থাকে তখনও তার মন চারপাশের প্রাণী-অপ্রাণী সকলের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করে নিতে চায়। সময় সময় সে সম্পর্কের ধরণ ভারী বিচিত্র এবং অচেনা রূপ নিয়ে থাকে। যেমন ধর হেমিংওয়ের লেখা 'দ্য ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী'র সেই বৃদ্ধ লোকটির কথা। একাট মাছধরা নৌকা নিয়ে বুড়ো একাই সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। অনেকটা দূর যাবার পর নৌকার পাশে ঝোলানো বড়শিতে টান পড়ল। এ ধরনের বড়শি জলের অনেক গভীরে ডোবানো থাকে, তাই বুঝতে একটু সময় লাগল। একটা বিরাট বড় মাছ টোপ গিলেছিল। বড়শি তার গলায় আটকে গেল, সে বড়শি ছাড়ানো কোনো মাছের পক্ষেই সম্ভব নয়। মাছ কিন্তু সহজে ধরা দিল না। গলায় বড়শি আটকে থাকা অবস্থায় সে নৌকাটিকে গভীর সমুদ্রের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। সূর্য অস্ত গেল, আকাশের তারা ফুটে উঠল, মাছ কিন্তু দূর সমুদ্রের দিকে চলেছে তো চলেছেই। সে হার মানতে রাজি নয়। তখনও মাছটির চেহারা দেখা যায়নি, তবু সেই প্রাণীটির শক্তি, ধৈর্য আর হার না মানার দুর্বার ইচ্ছে বৃদ্ধকে ভীষণ আশ্চর্য করে দিয়েছিল। অজ্ঞাত প্রাণীটির সঙ্গে সে মাঝে মাঝে কথা বলছিল। একবার বৃদ্ধ মাছটিকে উদ্দেশ্য করে বললো— তোমাকে আমি ভালোবাসি, তোমাকে আমি সম্মান করি। তবু কীজান, আমি নিশ্চিত জানি তোমার মৃত্যু হবে আমার হাতেই...

সমুদ্র - গভীরে যুদ্ধরত বিশালকায় মৎসবীরের সঙ্গে বৃদ্ধের কী যে এক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। মাথার ওপর কালো আকাশ, চারিদিকে অন্তহীন কালিঢালা অন্ধকার সাগর। নৌকার ওপর নিদ্রাহীন রাত কাটাছে এক বৃদ্ধ, একা অথবা একা নয়। জলের তলায় তারই শিকার মাছ তার সহযাত্রী। একক সমুদ্রাভিযানের রোমাঞ্চ তো আছেই, তবু মনে হয় বৃদ্ধের সঙ্গে ওই বিরাট না দেখা মাছটির যে আত্মীয়তা বোধ তৈরি হচ্ছে, সেটাই কাহিনীর এই অংশটির আসল মেজাজ।

মাছ তবু তো একটা প্রাণী। পিগমেলিয়নের গল্প জান কি তোমরা? পিগমেলিযান নামে এক তরুণ শিল্পী ছিল। সে পাথর কেটে মূর্তি তৈরি করতো। একবার অনেক দিন ধরে পিগমেলিয়ন একটি কল্পিত নারীমূর্তি খোদাই করল। তার নিজের সৃষ্টি দেখে সে নিজেই অভিভূত হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সে সেই মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকত। মূর্তির মেয়েটিকে শিল্পী ভালোবেসে ফেলল। পাথরের সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক গড়ে উঠল। গল্পে আছে যে, তার ভালোবাসা এবং মেয়েটিকে কাছে পাওয়ার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র হয়ে দাঁড়াল যে, পাথরের মূর্তি শেষ পর্যন্ত প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন গ্রীস দেশের এই গল্পটি নিয়ে মনস্তত্বের অনেক আলোচনা আছে। গল্পটি যে আগাগোড়া কাল্পনিক, তাতে কোনো সন্দেহ না থাকলেও, এর মধ্যে সত্যি যে একেবারেই নেই, তা জোর করে বলা যায় না।''

দেখতে দেখতে শুক্রবার এসে গেল। সৃলেখার ক্লাস এবারের মতো শেষ। মাস্টারমশায় এই যে এত কথা বললেন, এত উদাহরণ দিলেন, এ সমস্ত মনে থাকবে কি এদের? না থাকাই স্বাভাবিক। হয়তো কিছু কিছু থাকবে। কিন্তু ওই যে একটা গাধা নুনের বস্তা পিঠে নিয়ে চলেছে, পাশে পাশে হাঁটছে একটি লোক— এই ছবিটা ওদের মনে পাকাপাকি গাঁথা হয়ে থাকবে। দুটি প্রাণীর এই অতি সাধারণ পথ চলার পাশে পাশে অজস্র গল্পের যে বর্ণাঢ্য মিছিলটি চলেছে, তা যেন দেখতে পাওয়া যায়, এমন দুএকটা জানালা খুলে দিতে পেরেছেন মাস্টারমশায়। এইটুকুই চেয়েছিলেন তিনি। ক্লাসের শেষে যখন সকলে এক এক করে মাস্টারমশায়কে প্রণাম করল, মাস্টারমশায় সবাইকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন— ''তোমাদের তো অনেক পড়া, অনেক পরীক্ষা। জানি, তোমরা খুব ব্যস্ত। তবু তারই মধ্যে কখনো কখনো সময় করে নিয়ে নতুন কিছু ভেবো, নতুন কিছু লিখো।''